মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশি হত্যাকাণ্ড এবং বর্ণবাদপ্রবণতা

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান

যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা নামটি বিশ্ব জুড়ে লুণ্ঠন, দখল ও গণহত্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। শুধু তাই নয় একইসঙ্গে সেদেশের ভেতরেও বন্দুকের গুলিতে মানুষ খুনের ঘটনা খুব নিয়মিতভাবেই ঘটে থাকে। এরসঙ্গে আছে পুলিশ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড। এর পেছনে আছে শ্রেণীগত ও বর্ণগত বৈষম্যের কাহিনী। এর বিরুদ্ধে প্রায়ই বিভিন্ন এলাকায় জনবিদ্রোহের ঘটনাও ঘটছে। এরকম সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা নিয়েই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

২০১৪ সালের আগস্টে মিসৌরি রাজ্যের ফার্গুসনে পুলিশি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিবাদ, তা দমনে পুলিশের অযাচিত বল প্রয়োগ এবং সহিংসতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বপর্যায়ে বিরাজমান আপাত 'গণতান্ত্রিক' ভাবমূর্তির মুখোশটি খসে পড়ে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এই বিতর্কিত ভাবমূর্তির অবশ্য আরেকটি প্রকাশ বিশ্ববাসী দেখেছিল, ২০১১ সালে অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলনের সময়। সে সময় আন্দোলনকারীদের দমনের জন্য তাদের চোখে-মুখে পুলিশ কর্তৃক 'মরিচের গুঁড়া' ছিটানোসহ টেনে হিঁচড়ে নির্যাতন করে তাদেরকে গ্রেফতার করার ঘটনা 'অন্যরকম' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামনে নিয়ে এসেছিল।

ফার্গুসনে সহিংসতার সূত্রপাত ঘটে পুলিশের গুলিতে ১৮ বছরের মাইকেল ব্রাউনের মৃত্যুকে ঘিরে। বিষয়টি আরো জটিল হয়ে পড়ে, যখন সেন্ট লুইস কাউন্টির গ্র্যান্ড জুরি হত্যার দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার ড্যারেন ব্রাউনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা না করার সিদ্ধান্ত জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগও (জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট) একই রকম অবস্থান নেয়।

এ বছরের ১৯ এপ্রিল বাল্টিমোরের পুলিশ দ্বারা আটক ২৫ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ফ্রেডি কার্লোস গ্রের মৃত্যু আবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশি নির্যাতনের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। এ ঘটনাকে ঘিরেও শুরুতে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ এবং পরে পুলিশের সহিংসতা দেখা দেয় এবং সেই সহিংসতায় ৩৪ জন গ্রেপ্তার হয়, অন্যদিকে ১৫ জন পুলিশ অফিসারও আহত হয়। একইভাবে ১৩ জুলাই ঘটল পুলিশি হেফাজতে টেক্সাসের আয়ালার কাউন্টি জেলে কৃষ্ণাঙ্গ অধিকার আন্দোলনকর্মী সান্দ্রা ব্ল্যান্ডের হত্যাকাণ্ড। পুলিশ অবশ্য এই হত্যাকাণ্ডকে শুরুতে 'আত্মহত্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে সান্দ্রাকে ১০ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর সিনসিনাটিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ৪৩ বছর বয়সের আরেক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক স্যামুয়েল ডুবোস।

১৯ এপ্রিল বাল্টিমোরের পুলিশ দ্বারা আটক ২৫ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ফ্রেডি কার্লোস গ্রের মৃত্যু আবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশি নির্যাতনের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। এ ঘটনাকে ঘিরেও শুরুতে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ এবং পরে পুলিশের সহিংসতা দেখা দেয় এবং সেই সহিংসতায় ৩৪ জন গ্রেপ্তার হয়, অন্যদিকে ১৫ জন পুলিশ অফিসারও আহত হয়।

শুধু ফার্গুসন, বাল্টিমোর, টেক্সাস বা সিনসিনাটির ঘটনাই নয়, ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ২৭ মে ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের সময়পঞ্জিকায় (টাইমলাইন) দেখা যায় যে, ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ কর্তৃক গুলিবিদ্ধ কিংবা অন্য কোনো সহিংসতায় মোট আটজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যাওয়া একজন ভারতীয় নাগরিকও পুলিশের নির্যাতনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন। এ ঘটনাটি আলাবামা রাজ্যে ঘটেছে। নিহতদের তালিকায় ট্যামির রাইস নামের একজন ১২ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ বা আফ্রিকান-আমেরিকান শিশুও রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছিল ওহাইও রাজ্যের পুলিশ ২০১৪ সালের নভেম্বরে। এখন এমনও বলা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা নিয়মিতই ঘটে থাকে। বিশেষ করে শহুরে এলাকাগুলোতে এবং বাল্টিমোর, ফার্গুসন, টেক্সাস বা সিনসিনাটির ওই শহরগুলোই আসলে পুলিশি অনাচারের প্রতিনিধিত্ব করছে। পুলিশ কর্তৃক গুলিবিদ্ধ বা নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হওয়ার ক্রমবর্ধমান ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামোতে যে এক রকমের বর্ণবাদপ্রবণতা নিহিত আছে, সেই ব্যাপারটি এখন জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে।

এ ধরনের ঘটনায় মূলত কৃষ্ণাঙ্গদের মৃত্যু অথবা কৃষ্ণাঙ্গরা কেন এ রকম অবস্থার শিকার হচ্ছে, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা দুই ধরনের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। এক দল বিশেষজ্ঞ, সমালোচক, সমাজবিজ্ঞানী দায়ী করছেন অপরাধী চিহ্নিতকরণ এবং অপরাধ দমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে, যাকে তাত্ত্বিকভাবে 'ব্রোকেন উইন্ডোজ' বা 'ভাঙা জানালা' নামে অভিহিত করা হয়। আরেক দল এই সমস্যাটিকে মনে করছেন রাষ্ট্রের বৈষম্যপূর্ণ শাসন এবং নীতি কাঠামোর ফসল। তবে ব্যাখ্যার ধরন যা-ই হোক না কেন, এ দুই দল চিন্তাবিদ একটা বিষয়ে একমত যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বর্ণবাদপ্রবণতা রয়েছে এবং তারই শিকার মূলত আফ্রিকান-আমেরিকান শিশু, তরুণ কিংবা যুবকরা। এই লেখাটিতে মূলত বিশেষজ্ঞদের দুই ধরনের ব্যাখ্যার ওপরই আলোকপাত করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ দমনে পুলিশের 'ভাঙা জানালা' পদ্ধতি এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অপরাধী চিহ্নিতকরণ বা অপরাধ দমনে পুলিশের কাছে 'ভাঙা জানালা' পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ১৯৯০-এর দশকে। সেই সময় নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেন রুডি গিউলিয়ানি এবং বিল ব্রাউন নিযুক্ত হন শহরের ট্রানজিট পুলিশের প্রধান কর্তাব্যক্তি হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ব্রোকেন উইন্ডোজ' পদ্ধতিকে ঘিরে অপরাধ দমন ব্যবস্থা গড়ে

ওঠার পেছনে দুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা হলেন জর্জ কেলিং ও জেমস কিউ উইলসন। মাসিক আটলান্টিক নামের একটি পত্রিকায় ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ১০ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধে তাঁরা এই ধারণাটির প্রবর্তন করেন। 'ব্রোকেন উইন্ডোজ' ধারণাটিকে ঘিরে তাঁরা জনমানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্বের মূলকথা হলো, যদি কোনো ভবনের কোনো একটা ভাঙা জানালা সাথে সাথে মেরামত করা না হয়, তাহলে ওই ভবনের অন্য জানালাগুলো কেউ না কেউ ক্রমান্বয়ে ভেঙে ফেলবে। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা এই অভিমত দেন যে, সব ধরনের বিশৃঙ্খলা এবং অপরাধ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। দমনহীন একটা অপরাধ বা বিশৃঙ্খলা মেরামতহীন ভাঙা জানালার মতো আরেকটা অপরাধ বা বিশৃঙ্খলা ঘটাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে (কেলিং ও উইলসন, ১৯৮২:৩১)।

'ভাঙা জানালা' তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৯০-এর দশকে নিউ ইয়র্ক পুলিশ অপরাধ দমন পদ্ধতি দমনে নতুন মাত্রা যোগ করে। আর তার প্রকাশ ঘটে পুলিশ বিভাগের অপরাধ দমন সংক্রান্ত নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে; যেমন–'জিরো টলারেন্স' (zero tolerance), 'স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক' (stop and frisk) বা 'থামাও এবং জোর তল্লাশ করো', 'কমিউনিটি পুলিশিং' বা 'স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক পুলিশি ব্যবস্থা' ইত্যাদি (টাইবি, ২০১৫)।

কিন্তু ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অপরাধী চিহ্নিতকরণ এবং অপরাধ দমনে পুলিশের আচরণগত পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যদিও একটা সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটা আগ্রাসী পদ্ধতি পুলিশকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই সময় নিউ ইয়র্কে ছোটখাটো অপরাধের ঘটনায়ও (street crimes) বছরে ২০০০ জন খুনের শিকার হচ্ছিল। এই আগ্রাসী পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা অনেকটা কমে আসে (পূর্বোক্ত)।

২০০৫ সালে খোদ বাল্টিমোরে এই পদ্ধতির আওতায় ১,০৮,০০০ জনকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন এই শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬ লাখ।

তবে এই 'স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক' বা 'থামাও এবং জোর তল্লাশ করো' পদ্ধতিতে উৎসাহিত হয়ে এবং ২০১১ সালের টুইন টাওয়ার আক্রমণের ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে নিউ ইয়র্কের পুলিশ বর্তমানে ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। খোদ ২০১১ সালে নিউ ইয়র্কে এক বছরে ৬,৮০,০০০ নাগরিক এই *'থামাও এবং জোর তল্লাশ করো'* পদ্ধতির শিকার হয়। এর ৮৯% ছিল নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণাঙ্গ বা আফ্রিকান-আমেরিকান। ফিলাডেলফিয়া, সিয়াটল, নিউ অরলিন্স ও বোস্টন রাজ্যের পুলিশ বিভাগ এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ২০০৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ৮,৭০,০০০ জনকে 'থামাও এবং জোর তল্লাশ করো' পদ্ধতির আওতাভুক্ত করে। শিকাগো শহরের ক্ষেত্রে এই হার নিউ ইয়র্কের চার গুণ বেশি। খেয়াল করবার বিষয় হলো, ২০০৫ সালে খোদ বাল্টিমোরে এই পদ্ধতির আওতায় ১,০৮,০০০ জনকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন এই শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬ লাখ। ২০১৩ সালে ফেডারেল বিচারক শিরা শিন্ডিলিন একটি মামলার রায়ে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেন। তাঁর রায়ে তিনি বলেন: *"নিউ ইয়র্ক যে নীলনকশা প্রণয়ন করেছে, অন্য রাজ্যগুলো তা অনুসরণ করছে।"* (পূর্বোক্ত)।

এই 'স্টপ অ্যান্ড ফ্রিস্ক' পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিহ্নিত হয়েছে একটা 'সংঘবদ্ধ অনাচার' (organized harassment) হিসেবে। দীর্ঘ মেয়াদে এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত অপরাধ দমনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না, নিউ ইয়র্ক সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় এ রকমটাই দাবি করা হয়েছে। এই পদ্ধতিকেই এখন অনেকে দায়ী করছেন পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিকে। কেননা এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে পুলিশ যে কাউকে যে কোনো সময় আটকাতে পারছে যেখানে-সেখানে আর 'সন্দেহজনক' গতিবিধির জন্য পুলিশ গ্রেপ্তারও করতে পারছে। 'থামাও এবং জোর তল্লাশ করো' পদ্ধতির যত্রতত্র ব্যবহারের ফলে ৬৫ মিলিয়ন বা ৬.৫ কোটি মার্কিন নাগরিক পুলিশের খাতায় অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার সমান (পূর্বোক্ত)। তবে এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সত্যিকারের অপরাধী চিহ্নিত করার চাইতে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীগুলোকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রকাঠামো

বিশেষজ্ঞ বা সমাজবিজ্ঞানীদের যে দলটি পুলিশি নির্যাতনের কারণ খুঁজতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্যপূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামোকে দায়ী করেন, তাঁরা অবশ্য নির্যাতনের ঘটনা থেকে সূচিত প্রতিবাদ ও প্রতিবাদোত্তর সহিংসতাকে বেশি বিবেচনায় নেন। তাঁরা বলেন যে এই মৃত্যুগুলোকে ঘিরে যে প্রতিবাদ বা সহিংসতা, তার কারণ অনেক সুদূরপ্রসারী এবং গভীর। তাঁরা মনে করেন, এগুলোর কারণ হলো মার্কিন সমাজে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে সূচিত ক্ষোভ। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭২.৯% শ্বেতাঙ্গর রয়েছে নিজেদের বাসস্থান। আর কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৪৩.৫% (শ্যাশাটি, ২০১৪)। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের 'সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস' সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দারিদ্র্যপীড়িত হবার আশঙ্কা শ্বেতাঙ্গ শিশুদের চাইতে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের তিন গুণ বেশি। শুধু তা-ই নয়, কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ার কারণে তাদের মাঝে বেকারত্বের হারও বেশি। এবং স্বাস্থ্যগত চিত্রও তাদের খুব ভালো নয় (দেখুন, http://www.apa.org/pi/ses/resources/ publications/factsheet-erm.aspx)। মানব উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আসলে পিছিয়ে পড়েছে আফ্রিকান-আমেরিকান জনগোষ্ঠী। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বজনের হয়ে ওঠেনি তাদের কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হওয়া মানে এই নয় যে, সব কৃষ্ণাঙ্গকে বা মোটা দাগে সব সংখ্যালঘিষ্ঠকে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা সমানভাবে ধারণ করে তাদের অর্থনৈতিক বা উন্নয়ন নীতিতে।

রাষ্ট্রের কাঠামোগত বৈষম্যের বিষয়টি ফার্গুসনের আলোকে আরো বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন রিচার্ড রথস্টেইন তাঁর 'দ্য মেকিং অব ফার্গুসন : পাবলিক পলিসি অ্যাট দ্য রুটস অব ইটস ট্রাবলস' নামের গবেষণাধর্মী এক প্রতিবেদনে। তিনি উনিশ আর বিশ শতকে কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের মার্কিন সরকারগুলো দ্বারা গৃহীত জননীতিকে (public policies) দায়ী করেন। তাদের গৃহীত জননীতিগুলো শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের সামাজিক বিভাজনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, যদিও একবিংশ শতকে ওইসব নীতির অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সেই বর্ণ-বিভাজন এবং বৈষম্য প্রজন্মগতভাবে সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাব তৈরি

করেছে মার্কিন সমাজে, বিশেষ করে ফার্গুসন, সেন্ট লুই বা বাল্টিমোরের মতো মেট্রোপলিটনগুলোতে।

রিচার্ড রথস্টেইন মিসৌরি রাজ্যের ফার্গুসনের কাছাকাছি অবস্থিত সেন্ট লুই শহরের উদাহরণ দিয়ে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন কিভাবে বিশ শতকের শেষের দিকে সরকারিভাবে গৃহীত উন্নয়ন নীতিমালা অনুযায়ী শহরটিকে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত আলাদা আলাদা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। ওই নীতিমালা অনুযায়ী শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চলকে আবাসিক এলাকা, কৃষ্ণাঙ্গ অঞ্চলকে বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকবিহীন এলাকায় উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি পর্যন্ত দিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার শর্ত বেঁধে দেয় যে ওখানকার কোনো ঘরবাড়ি, জমি বা অন্য কোনো সম্পদের মালিকানা কৃষ্ণাঙ্গ কোনো নাগরিকের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।

বাসস্থান বা আবাসিক অঞ্চলকে ঘিরে যে বিভাজন/বৈষম্য নীতি, তা কিন্তু শ্রমের বাজার বা সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। মার্কিন প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণা অনুযায়ী, ২০১৩ সালে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলোর মোট সম্পদ শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর চাইতে ১৩ ভাগ কম, যা ২০১০ সালে ছিল আট ভাগ কম (ফ্রাই ও কোচার, ২০১৪)। বর্ণবৈষম্য রোধে প্রণীত সিভিল রাইটস অ্যাক্ট ১৯৬৪ পরবর্তী ১৯৬০-এর দশকে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান নাগরিকের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকের বেকারত্বের হার ছিল দুই থেকে আড়াই গুণ বেশি। ২০১৪ সালে এসেও কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের অবস্থার তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। এই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে বেকারত্বের হার ৬.২% হলেও কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই হার ১১.৪%। আর শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের বেকারত্বের হার ৫.৩% (দ্য গ্লোবালিস্ট, ২০১৪)। একইভাবে সেন্টার ফর আমেরিকান প্রোগ্রেসের ২০১৩ সালের এক হিসাব অনুযায়ী আফ্রিকান-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের দৈনিক উপার্জন অহিস্পানিক (non-Hispanic) শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের দৈনিক উপার্জনের ৬৪%। হিস্পানিক নারীদের ক্ষেত্রে এই চিত্র আরো করুণ। তাদের দৈনিক উপার্জন অহিস্পানিক শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের দৈনিক উপার্জনের ৫৪%। তবে এশিয়ান-আমেরিকান নারীরা এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থায় আছে। তাদের ক্ষেত্রে এটা ৯০%।

উপসংহার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপাত ভাবমূর্তি দেখে এটা বোঝা সম্ভব নয় যে এই রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক কাঠামোতে বৈষম্যমূলক উপাদান এতটা প্রকট। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশি নির্যাতন বা অন্য কোনো কারণে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক বা তরুণদের মৃত্যু রাষ্ট্রটির এই অন্ধকার দিকটি সামনে নিয়ে এসেছে। এই অন্ধকার দিকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীগণ যে ব্যাখ্যাই দেন না কেন, এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সব বর্ণের, ধর্মের সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক বা অর্থশক্তিতে দুর্বল জনগোষ্ঠীই সবচাইতে বিপদগ্রস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশি ব্যবস্থাপনা তথা রাষ্ট্রকাঠামোতে। বিশেষ করে ৯/১১ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্র হিসেবে আরো বেশি 'নিরাপত্তাকাতর' হয়ে পড়েছে। ফলে ফার্গুসন বা বাল্টিমোরের হত্যাকাণ্ড এবং জনমানুষের প্রতিবাদ কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণকে উন্মোচন করলেও অন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যে একই ধরনের ঘটনার শিকার হচ্ছে না, তা কিন্তু নিশ্চিত নয়। একথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, এই রাষ্ট্রের মালিকানা সর্বজনের নয়, ধনী আর শক্তিশালীদের পক্ষেই রাষ্ট্রের কাঠামো। এই কর্পোরেট রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ অবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন হবে, বিষয়টি তা-ও নয়। তবে অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলন থেকে শুরু করে বাল্টিমোর পর্যন্ত জেগে ওঠা মানুষের প্রতিবাদ এটা নির্দেশ করছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের মালিকানা করায়ত্ত করতে এখন অনেক সচেষ্ট।

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক

ইমেইল: atanzim04@gmail.com

তথ্যসূত্রঃ

[কেলিং ও উইলসন, ১৯৮২] Kelling, G. L. and J.Q. Wilson (1982), "Broken windows: the police and neighborhood safety", Atlantic Monthly, March, vol. 249, no. 3, pp. 29–38.

[শাশাটি, ২০১৪] Shashaty, A.F. (2014), "Ferguson Shows Failed US Policy and the Black-White Housing Gap", 17 August. http://newamericamedia.org/2014/08/behind-fergusons-unrest-failed-federal-policy-and-the-black-white-housing-gap.php

[রথস্টেইন, ২০১৪] Rostein, R. (2014), "The Making of Ferguson: Public choices at the Roots of Its Troubles", http://www.epi.org/publication/making-ferguson/. Accessed 17 July 2015.

[দি গেণ্ডাবালিষ্ট, ২০১৪] The Globalist (2014), "African Americans: The State We're In", available at http://www.theglobalist.com/african-americans-the-state-were-in/. Accessed 17 July 2015.

[টাইবি, ২০১৫] Taibbi, M. (2015),Why Baltimore Blew Up, The Rolling Stone, 26 May, http://www.rollingstone.com/politics/news/why-baltimore-blew-up-20150526. Accessed 17 July 2015.

[ফ্রাই ও কোচার, ২০১৪] Kochhar, R. and R. Fry (2014), Wealth inequality has widened along racial, ethnic lines since end of Great Recession, available at http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/12/12/racial-wealth-gaps-great-recession/. Accessed 17 July 2015.